মাওবাদীদের গেরিলা থিয়েটার

সৌমিত্র দস্তিদার

"নিকৃষ্টতম অশিক্ষিত হচ্ছে সে, যে 'রাজনৈতিকভাবে অশিক্ষিত' সে শুনতে চায় না, বলতে চায় না, রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করে না। সে জানে না, জীবনের মূল্য। ধান-মাছ-আটা-বাস ভাড়া-জুতো বা ওষুধের দাম—সবকিছু নির্ভর করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর। এই রাজনৈতিক অশিক্ষিতরা এতই মূর্খ যে, বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলে—রাজনীতিকে ঘৃণা করি। এই নির্বোধ জানে না, তার রাজনৈতিক অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয় ভ্রাম্যমান বেশ্যা, পরিত্যক্ত সন্তান এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ভণ্ড রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ এবং দেশি-বিদেশি কর্পোরেট কোম্পানির ভৃত্য দালাল।"

—বের্টল্ট ব্রেখট

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। শীতের রাত। ঠাণ্ডা কোয়েল নদী পেরিয়ে চলেছি পালামুঁর জঙ্গল-পাহাড় ঘেঁষা মাওবাদী ডেরায়। আকাশে ঝকঝকে চাঁদ। ঠাণ্ডা জল পেরোতে পেরোতে কানে আসছে ধামসা মাদলের বোল। আদিবাসী গ্রাম চারপাশে। তাই অবাক হবার কিছু নেই। মাদলের শব্দ তীব্র হচ্ছে। ক্রমে পৌঁছে গেলাম সেই গ্রামে। বিস্ময়ের তখনও বাকি! রাইফেল হাতে মাওবাদী গেরিলা। সঙ্গে প্রচুর গ্রামবাসী। ভিড় জমেছে যেখানে সেখানেও এগিয়ে গেলাম। ওইখানেই মাদল বাজছে। নাটক হচ্ছে। পথনাটক। হাততালি পড়ছে। কাহিনি জানি না। বিপ্লবী কথা কানে আসছে। এক তরুণী আচমকা প্রায় জঙ্গল থেকেই ঢুকে পড়ল অন্যান্য কুশীলবদের মাঝে। হাতে মস্ত লাল পতাকা। চাঁদের মায়াবি আলোয় উজ্জ্বল সেই পতাকা। নাটকের দল হঠাৎই মিছিলের ভঙ্গিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। তরুণীটি গান ধরল—'লাল সিনা চলে গাঁও গাঁও মে, দেখে শোষক ঘাবড়ায়'।

অন্যেরা ধুয়ো দিতে দিতে সামনে এগোল। নাটকটি পুরো দেখিনি। বুঝলাম এ রাজনৈতিক প্রচারেরই এক অংশ। পরবর্তী সময়ে মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বুঝতে চেষ্টা করেছি মাওবাদীরা যে থিয়েটার করেন তার শিকড় কোথায়। ফর্মের সঙ্গে অন্যান্য চেনা নাটকের সাযুজ্য কোথায়।

বিপুল বিস্তীর্ণ যে এলাকায় মাওবাদী রাজনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য, চলতি বা মিডিয়ার কথায় যার পরিচিতি রেড করিডর, সেই বস্তার, দন্ডকারণ্য, পালামুঁ, জেহানাবাদ ভোজপুরের সর্বত্রই দলিত আদিবাসীদের বাস। দন্ডকারণ্য, বস্তার, গরচৌলি যেখানে মাওবাদীদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি তা ভারতের অন্যতম আদিবাসীপ্রধান এলাকা। গোন্ড, কয়া, মারিয়া, গদবা ইত্যাদি। বস্তুত দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দাদের অন্যতম। কয়েকবছর ধরে মাওবাদী রাজনীতির চর্চা করতে করতে আমার মনে হয়েছে, বহু জায়গায় বলেছি, লিখেওছি—মাওবাদী

রাজনীতি অন্তত এদেশে যত না সাবেক বামপন্থা, তার চেয়ে অনেক বেশি আদিবাসী বিদ্রোহ। কিছু কিছু জায়গায় চেনা ছকের বামপন্থীর বাইরে গিয়ে নিও লেফ্‌ট্‌ রাজনীতির সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি। বিশেষ করে ল্যাতিন আমেরিকার চিলি, পেরু, বলিভিয়ার বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে। আবার এককথায় নিও লেফ্‌ট্‌ও বলা যাবে না কারণ তত্ত্বগত দিক দিয়ে মাওবাদীরা ধ্রুপদী মার্কস্‌বাদী পথেই চলতে আগ্রহী। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ ও মাওবাদ। মাও সে তুং-এর দর্শন মাওচিন্তাধারা মাওবাদ তা নিয়ে সারা পৃথিবীতেই মার্কসীয় শিবিরে তর্ক আছে। মজা হচ্ছে, অন্যান্য অনেক দেশের মতো এদেশেও 'মাওবাদ' বলার সমর্থকেরা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠায় যে যে যুক্তি দেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি। এটা সত্য যে মাও-এর শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে অসাধারণ ইয়েনান ভাষণ শুধু নয় তার চিন্তা ভাবনায় অন্যান্য অনেক কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের চেয়েই সংস্কৃতি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যান্ত্রিক মার্কসবাদীদের মতো শুধু অর্থনীতির কাঠামো পরিবর্তনের বদলে পাশাপাশি জোর দিতেন সংস্কৃতির উপরি কাঠামোয়। অর্থাৎ সমাজ বদলের লড়াই-এ সংস্কৃতি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে—এই বিশ্বাস মাও সে তুং-এর ছিল। তিনি বলতেন—বিপ্লবের জন্যে আমাদের দুটো অস্ত্র দরকার। এক—বন্দুক, দুই—সংস্কৃতি।

এদেশের মাওবাদীরাও কথাটা অন্তত তত্ত্বগতভাবে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। আবার এটাও ঠিক একইভাবে ভারতের মাওবাদী রাজনীতিতে সংস্কৃতির নির্দিষ্ট সংজ্ঞাও ঠিক প্রচলিত ছকে মিলবে না। তাদের জননাট্যমণ্ডলী বা চেতনা নাট্যমণ্ডলী দুটোতেই নাটক শব্দটা থাকলেও আমরা যেভাবে নাটক নিয়ে আলোচনা করি বা তাকে নানাভাবে ভাগ করি, গ্রামে গ্রামে জঙ্গলে জঙ্গলে মাওইস্ট পলিটিক্সের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যে নাটক অভিনীত হয় তা প্রসেনিয়াম নয়ই, পথ নাটক বা তৃতীয় থিয়েটারও বলা চলে না। মাওবাদী তাত্ত্বিক কোবার্ড গান্ধী একবার জানিয়েছিলেন—এ হচ্ছে গেরিলা থিয়েটার। ওই থিয়েটার আচমকা শুরু হয়ে যায়। সেই অর্থে কোনো স্ক্রিপ্ট নেই, মহলার তো প্রশ্নই নেই। কখনো কখনো সন্ধেবেলায় কোনো এক গেরিলা তরুণী গান ধরলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দু-একজন তরুণ-তরুণী কথা বলতে বলতে এমনভাবে সামনে চলে এলেন বোঝা যাবে নাটক শুরু হয়ে গেছে। আসলে মাওবাদীরা যে চলমান জনযুদ্ধের কথা বলে তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়েছে ওই গেরিলা নাটক—যাকে চলমান নাটকও বলা চলে।

তবে বিহার, ঝাড়খণ্ডের গয়া, পালামুঁ, জেহানাবাদ বা অন্যান্য গ্রাম এলাকায়, বিয়ন্ত জলপুরায় ছবিটা কিছুটা অন্যরকম। সেখানে গ্রামীণ লোকনাট্য মহারাষ্ট্রের তামাশা, এমনকী ধর্মীয় নাটকের ফর্ম অনুসরণ করেও মাওইস্টরা নাটক করেন। যা বস্তারে একেবারেই হয় না। আসলে বস্তার, দন্ডকারণ্যে দমন এত তীব্র তেমনি মাওবাদী আর্মির দাপটও বেশি—সব মিলিয়ে ছবিটা পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্র। ফলে যা হবার হয়—নাটকও হয়ে পড়ে গেরিলা। এই শুরু হয়েছে, বিপদের আশঙ্কা মাত্র যে কুশীলবেরা সংলাপ বলছিলেন গ্রামীণ পোশাকে, তারা বিদ্যুৎগতিতে পোশাক পাল্টে পুরোদস্তুর সেনা জওয়ান। চোয়াল লম্বা, কঠিন চোখ। হাতে শক্ত করে ধরে রাখা অত্যাধুনিক অস্ত্র। দন্ডকারণ্যের সকাল বিকেল এভাবেই হাত ধরাধরি করে পথ চলে রাজনীতি ও সংস্কৃতি।

মাওবাদী ডেরায় প্রথমবার যাবার নানা অভিজ্ঞতা এখনও ভুলতে পারিনি। প্রায় টানা চোদ্দ-পনেরো দিন। রোজ সকাল বিকেল মিলিয়ে দশ, কুড়ি, তিরিশ কিলোমিটার গভীর জঙ্গলে যেতে যেতে মনে হত—এ কোন ভারত? নন্দন, রবীন্দ্রসদন, কফিহাউস—নাটক, সিনেমা, বিপ্লব নিয়ে সুশীল তর্ক বাবু ভদ্দরলোকের সংস্কৃতির বাইরে অন্য এক জনজীবনে তখন ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। আমি ও আমার ক্যামেরাম্যান, ডকুমেন্টারি করার প্রবল আগ্রহে চলে এসেছি ভয়ঙ্কর সুন্দর এই বস্তারের গভীরে। দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারছি, জলের শব্দে নদী কত দূরে। তারা দেখতে দেখতে ঠিক হচ্ছে পথ নির্দেশ। সামান্য দূর থেকে ভেসে আসছে অজানা জন্তুর ডাক। হায়নায় হাড় হিম হয়ে যাওয়া অট্টহাসি।

অন্ধ্র বস্তারের লাগোয়া গ্রামে মাওবাদী বেস ক্যাম্প। অস্থায়ী। চলমান জনযুদ্ধে কখনো কিছু স্থায়ী হয় না। এ জায়গাটা ভালো। আঁটোসাঁটো পাহারা নেই। মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের মতো। ব্যাডমিন্টন কোর্ট। হসপিটাল। লাইব্রেরি। ভিডিও দেখা হচ্ছে। প্রথম রাতে দেখলাম নাটক—যার ভাষা গোন্ডি। কিছুই বুঝলাম না। একটু-আধটু আন্দাজ করলাম যে নাটকটি মূলত তেলেঙ্গানা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। পরেও দেখেছি ছোট ছোট চলমান নাটকে একের পর এক তুলে আনা হচ্ছে। তেলেঙ্গানা ভূমকাল, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বিবিধ বিদ্রোহ পাশাপাশি শহিদদের কথা, সামাজিক শোষণ শাসকদের অত্যাচার জরুরী অবস্থা। সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুত্ব নানা ঘটনা। কোনো নাটকই দীর্ঘ সময়ের নয়। দশ পনেরো

মিনিট। ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত আপাত কঠিন বিষয় নিয়ে নাটক করছ তোমরা রিহার্সাল কখন দাও? ডিরেক্টর কে? বা লেখা কাদের? ওরা হেসে বলত—আমাদের নিয়মিত রাজনৈতিক ক্লাস হয়। জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারত রাষ্ট্রের অবস্থা তার বিদেশ নীতি ও পুরনো দিনের অজস্র কাহিনি, অত্যাচার, শহীদদের কথা। ওই ক্লাসই বলতে পারেন আমাদের নাটকের কাহিনি নির্মাণ বা রিহার্সাল দেওয়া। মাঝে মধ্যে আমরা যে কয়েকজন সরাসরি পার্টির সদস্য তারা দেশে বিদেশে কী ধরনের নাটক হচ্ছে তা নিয়ে চর্চা করি। একটু-আধটু সময় পেলে রিহার্সালও দিই। কিন্তু সময়ের খুব অভাব।

কথাটা ভীষণ সত্যি। বেস ক্যাম্পেও পার্টি কমরেডদের দৈনিক রুটিন এক্কেবারে শৃঙ্খলাবদ্ধ মিলিটারিদের মতোই। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে ওঠা—রাত পাহারার বাঁশি শোনার সঙ্গে সঙ্গে। সাড়ে চারটে থেকে মার্চ। শারীরিক কসরৎ—ফিজিক্যাল ট্রেনিং—সাতটা অবধি। তারপর দু-ঘন্টা নিজের নিজের অস্ত্র পরিষ্কার করা। নটায় ব্রেকফাস্ট। সাড়ে নটা থেকে পার্টি ক্লাস বা লাইব্রেরীর পড়া। একটায় লাঞ্চ। দুটো থেকে আবার পার্টি ক্লাস। চারটে-সাড়ে চারটেয় বিকেলের চা। তারপর একটু ব্যাডমিন্টন, ভলিবল খেলা, তারপরে-পরেই অস্ত্র ট্রেনিং। সন্ধে ছটায় জলখাবার। সাড়ে আটটা-নটায় রাতের খাবার। তার মাঝে সংস্কৃতি।

তবু বলব বস্তার দন্ডকারণ্যে সংস্কৃতি অনেক বর্ণময়। বিহারে কিছু গতানুগতিক। ফর্মে তো বটেই। কনটেন্টেও। ওখানে বিষয়গুলো মোটা দাগের। সেই জমিদার, জোতদার, অত্যাচার—সবটাই সাদা কালোয় ভাগ করা। তাছাড়া অধিকাংশ নাটক বেশ শ্লথ।

তুলনায়, তুলনাই বা বলছি কেন, অন্ধ্র, ওড়িশা, বস্তারের নাটক, গান, কথকথা, নাচ—সবমিলিয়ে সংস্কৃতির চেহারাটা অসম্ভব বর্ণময়। এর একটা কারণ অবশ্যই দন্ডকারণ্যে বস্তারের আদিবাসী জীবনের যে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও ছন্দময় সংস্কৃতি আছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে মাওবাদী গণসংগ্রামেও। একবার আগেও বলেছি যে মাওবাদী রাজনীতি নিঃসন্দেহে আদিবাসী গণআন্দোলন। স্বাধীনতার পর থেকে তথাকথিত উন্নয়নের নামে যা ঘটেছে তার ফল হয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী উচ্ছেদ।

বস্তার খনিজ সম্পদে পূর্ণ এক সমৃদ্ধ ভূগোল। সেখানে ভূমিপুত্রদের নানাভাবে বঞ্চিত করে তাদেরই সম্পদ তুলে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে বহুজাতিক পুঁজির হাতে। মাওবাদী রাজনীতির মূল ভিত্তি ওই হাজার হাজার আদিবাসী জনতা। থিয়েটারও যদি দেখেন তাও কিন্তু নির্মিত হয় আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সংগতি রেখে। শাসক যখন কম শক্তিশালী তখন পথনাটক, ব্যালে, নাট্যসংগীত—সবই শক্তিশালী ভূমিকা নেয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে তীব্র করতে। আবার রাষ্ট্রীয় দমন যত বাড়ে তখন জঙ্গলের গভীরে গ্রামের ভেতরে অত্যন্ত গোপনে, জনগণকে সংগঠিত করতে চলতে থাকে গেরিলা থিয়েটার। বস্তারে তো বটেই বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডের থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য সংগঠন বিস্তার ও জনচেতনা বৃদ্ধি। তাই সব থিয়েটারই রাজনৈতিক থিয়েটার। এই সব থিয়েটার সমৃদ্ধ হয়েছে লোক আঙ্গিকের বহুল উপকরণ থেকে। নাচ, গান, মূকাভিনয়, নাটক, কথকতা—সব এই লাল করিডরে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্ধ্র বস্তারে তো ভাগবত পুরানগাঁথাও রাজনীতির ভাষ্যে পরিণত হয়েছে।

বস্তারের সংস্কৃতিতে, থিয়েটারের শৈলীতে বহু পরিবর্তন এনেছেন জনপ্রিয় লোকশিল্পী গদার। আসলে তার নাম ভিটঠল রাও। তেলেঙ্গানা মুক্তি সংগ্রাম ও শ্রীকাকুলামের গিরিজান বিদ্রোহ ভিত্তি নির্মাণ করেছে আজকের বিপুল বিস্তৃত মাওবাদী উত্থান। সত্তরের নকশাল রাজনীতির সময়ও অন্ধ্র উত্তাল। করিমনগর, খাম্মাম, বিজয়নগরম—সর্বত্র ছাত্রেরা দলে দলে গ্রামে যাচ্ছেন। সেকেন্দ্রাবাদে সিনেমা পরিচালক নরসিং রাও গড়ে তুলেছিলেন—'আর্টলাভার্স'। মার্কসবাদী এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কাছে গদার ও অন্যান্য বিপ্লবী শিল্পীরা নানাভাবে ঋণী। পরবর্তী সময়ে গদার ও অন্যান্য কয়েকজন আর্টলাভার্স নাম বদলে নতুন নাম করলেন জননাট্যমণ্ডলী। গদার ও আর সবাই ঘোষণা করলেন তাদের সব গান, নাটক, কাহিনি প্রকাশিত হবে সমষ্টিগত পথে। পাঞ্জাবের বিপ্লবী সংগঠন গদারের নামে। সেই সময় থেকে ভিটঠল রাও হয়ে গেলেন চারণ শিল্পী গদার।

মাওবাদী সংস্কৃতিতে গদারের প্রভাব বিশাল। জঙ্গলে জঙ্গলে যে গেরিলা থিয়েটার তাদের শৈলী পুরোপুরি গদার ঘরানার।

গদার ও তার সংগঠন একসময় অন্ধ্র বস্তারের কয়েক হাজার মাইল চষে ফেলেছিলেন বুর্‌বা কথা ও গান নিয়ে। বুর্‌বা কথা অনেকটা আমাদের আলকাপের মত। আগে থেকে কোনো চিত্রনাট্য থাকে না। দলের সদস্য নির্দিষ্ট নেই।

একজন গান ধরলেন—লাল লাল লাল ঝাণ্ডা।

একজন হঠাৎ জনগণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—এবার তাহলে লাল পতাকায় গান গাই।

এক তরুণী বলতে বলতে এগোলেন—পতাকা রং-এ চোবানো হয়েছে? জলে চোবানো হয়েছে?

পিছন থেকে এক কবির গলা শোনা যায়—সারা রাস্তা কলিজার রক্তে তর্পণ করতে করতে এগোয়।

কথা—সেই রক্তে ডোবানো লাল পতাকার গান।

শোনা যায় গান—লাল লাল লাল ঝাণ্ডা সগর্বে উড়ছে। উড়তেই থাকবে।

অভিনেতা দু-চারজন মুখের এক্সপ্রেশন করতে করতে প্রায় নাচের ভঙ্গিতে চারদিকে ঘুরতে থাকে। লোকে শ্লোগান তোলে। আপাতভাবে এও মোটা দাগের মনে হলেও মাথার ওপরে দ্রোণ চক্কর মারছে। মিলিটারি অবরুদ্ধ জঙ্গলের গভীরে হ্যাজাকের আলোয় ওই নাটক কতটা ছাপ ফেলে জনমনে তা সামনাসামনি না দেখলে শহুরে ড্রইংরুমে বসে বোঝা মুস্কিল।

মাওবাদী ঘাঁটিতে থিয়েটারের তাই আলাদা চেহারা বা সংজ্ঞা নেই। থিয়েটার, গান, নাচ, মূকাভিনয়—সব একাকার হয়ে যায়। সেই সঙ্গে অসাধারণ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং। মুখের চোখের হাতের পায়ের নানা অভিব্যক্তি থিয়েটারকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

মনে আছে বস্তার মহারাষ্ট্রের সীমান্ত গরচৌলিতে একবার দুই মাওবাদী তরুণ-তরুণীর বিয়েতে গেছিলাম। সামান্য আয়োজন। রেড বুক সাক্ষী করে কিছু শপথ পাঠ। তারপরে সন্ধেবেলায় নাটক ও গানের অনুষ্ঠান। অবাক হয়ে দেখছিলাম লাল পতাকাও কেমন চরিত্র হয়ে পড়ছে। আপাত সহজ ভঙ্গিতে গভীর রাজনীতি উঠে আসছে নাটকে। ওই নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'মিছিল'। ছোট ছোট ঘটনা উঠে আসছিল লাল ঝাণ্ডা নিয়ে একটি সামনে এগোনো মিছিলে। সাধারণত মাওবাদী স্কোয়াড বা প্ল্যাটুনের ঠিক আগে প্রহরী হয়ে থাকেন মহিলারা। স্কোয়াড হচ্ছে আট-ন জনের এক দল। প্ল্যাটুন কুড়ি থেকে পঁচিশ জনের বাহিনী। সেদিন গভীর জঙ্গলে বসে শুনলাম নাটক হবে। বসে আছি। রাত বাড়ছে। অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। আকাশে চমৎকার তারার সমাবেশ। অপেক্ষা চলছে। এমন সময়ে সিনেমার ভাষায় এক স্টিম লং শটে ভেসে আসতে লাগল গানের সুর। লং মিড ক্লোজ, ক্লোজ, বিগ ক্লোজে সামনে দিয়ে যাচ্ছে হাতে ঝাণ্ডা নেওয়া এক তরুণী। তখনও বুঝিনি উনি নাটকেরই 'কথক ঠাকরুণ।' দ্রুত পজিশন নিলেন অন্য চার-পাঁচজন। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে হায়নার হাসি। তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে চমৎকার সুরেলা গান—'জোহার লো জোহার লো শহীদলোগ সব জোহার লো'... শহীদ স্মরণে ওই নাটক পুরো সময় ধরলে একঘন্টা। তার মধ্যে ছোট ছোট নানা অধ্যায়, শহীদ গাঁথা, বিপ্লবের স্বপ্ন, হিন্দুত্ববাদীদের রাজনৈতিক আক্রমণ—সবই উঠে আসতে লাগল। কখনো কুশীলবেরা গোল হয়ে ঘুরতে লাগলেন। কখনো হাত ধরাধরি করে তৈরি হল ছোট বড় বৃত্ত। সেই বৃত্তের মধ্যিখানে অ্যাক্রোব্যাট বা রাশিয়ান ব্যালের মত শরীরী ছন্দ। গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন চমৎকার। জল খাবার ড্রাম, থালা, বাটি, চামচ—সব মিলিয়ে অনবদ্য এক সিমফনি।

আদিবাসী জীবনে যেমন সংস্কৃতি এক স্বাভাবিক বিষয়, এখানেও তাই। আলাদা করে পার্টির সাংস্কৃতিক দল আছে। কিন্তু মাওবাদীদের সবাই লেখক, সবাই গায়ক, সবাই অভিনেতা। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে আর একটি বিষয় মাওবাদী রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে আশির দশক থেকে এই দু'হাজার পনেরোর মাওবাদী আন্দোলন যে এত বিস্তৃত হয়েছে তাতে নাটক, গান, নাচ, অনুঘটকের আসল কাজ করে চলেছে নিরন্তরভাবে। স্ট্রাকচারাল লেফট যেমন সংস্কৃতিকে নেতাদের বক্তৃতা মঞ্চে লোক টেনে আনার হাতিয়ার করে তুলেছে, মাওইস্টরা কিন্তু তার বিপরীতে গিয়ে সংস্কৃতি ও জীবন এক করে দিয়ে হতদরিদ্র আদিবাসী জীবনে পৌঁছে গেছে। হয়ে উঠেছে তাদের একান্ত আপনজন। তাই বলছিলাম, মাওবাদী রাজনীতির সঙ্গে নিও লেফ্‌ট্ পলিটিক্স ও ল্যাতিন আমেরিকান সংগ্রামের প্রভূত মিল আছে। থিয়েটারের ভাষা নিয়ে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। তেলেঙ্গানা অঞ্চলই আজকের মাওবাদী রাজনীতির সূতিকাগার। তাই তেলেগু সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। তেলেগু ভাষারও। কিন্তু চলমান জনযুদ্ধ যেখানে যেখানে বিস্তৃত হয়েছে সেখানকার ভাষা, শব্দ, যাপন এক টোটাল কালচারের জন্ম দিয়েছে। যারা ফুটবল সম্পর্কে একটু-আধটু খোঁজখবর রাখেন তারা বুঝবেন, কীভাবে হল্যান্ড এই টোটাল ধারা সৃজন করেছিল। সাবেক ফর্মেশন ভেঙে তারা সংঘবদ্ধ হয়েছিল পুরোদস্তুর এক দল হিসেবে। যেখানে সবাই ডিফেন্ডার, সবাই সেন্টার হাফ মিডফিল্ডার অ্যাটাকার।

মাওবাদী সংস্কৃতিও তাই। কোনোভাবেই আলাদা করে এদের ভাগ করা যাবে না। যিনি নাটক লিখছেন তিনি হাতে রাইফেল

নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই নিবিষ্টভাবে পড়ছিলেন নেরুদা, লোরকা, সুববা রাও পানিগ্রাহি চেরবান্দা রাজু বা শ্রীশ্রীর কবিতা। এই রোমান্টিকতার ছাপ মাওবাদী এলাকার সাংস্কৃতিক জাগরণেও স্পষ্ট। এক এক জায়গায় ভাষাও বদলাতে বদলাতে এক অদ্ভুত নিজস্ব ভাষার চেহারা নিয়েছে। তেলেগু, গোন্ডি, ওড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি, ভোজপুরি, ছত্তিশগড়ি—সব মিলিয়ে এক নতুন জীবন্ত ভাষা সৃষ্টি হয়েছে রেড করিডরে।

মাওবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ। সংস্কৃতিও। ফলে কর্মী সমর্থকেরাও অনেকেই গোপনে শিক্ষা নেন সংস্কৃতির নানা কর্মশালায়। কেরলের সমুদ্র উপকূলেও ইদানীং মাওবাদী রাজনীতি প্রভাব ফেলছে। আমাদের যত ফিলম্ মেকার গোপাল মেনন ও সোশ্যাল অ্যাকটিভিস্ট রাজেশ মাধবন কথায় কথায় বলছিল সমুদ্রতীরে জেলে গ্রামগুলোতে অজস্র কথাকলি ওয়ার্কশপ হয় সেখানে কেউ কেউ লুকিয়ে শিখে লাল করিডরে নাটককে অন্য এক মাত্রা দেন। আগেও বলেছি, মনে রাখবেন মাওইস্ট কালচারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। এক—ফর্ম লোকনাট্যের কিন্তু কনটেন্ট রাজনৈতিক, দুই—নানা সাংস্কৃতিক শৈলীকে আত্মীকরণের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে এক নতুন থিয়েটার, সংগীত, নৃত্য যা একান্তভাবে মাওবাদীদের নিজস্ব উদ্ভাবন। তাকে গেরিলা থিয়েটার বলা যায়। আরও বলা যেতে পারে আন্ডার গ্রাউন্ড কালচার। দুটি বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আরও একটি বিষয় বলা উচিত—রাজনৈতিক প্রচার আসল উদ্দেশ্য হলেও সচেতন বা অবচেতনে মাওবাদী সংস্কৃতি ভেঙে দিচ্ছে যাবতীয় স্ট্রাকচারাল হেজিমনিকে। সংস্কৃতি হয়ে যাচ্ছে সংগ্রামের অগ্রবাহিনী। রিহার্সালের সময় থাকে না বলে নিয়মিত প্রস্তুতি নিতে পারে না থিয়েটার কর্মীরা।

এই শিল্পীদেরও আবার দুটি ভাগ। যারা সরাসরি বন্দুক নিয়ে গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিতে জঙ্গলে পৌঁছে গেছে তারা যখন সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তখন নাটক, থিয়েটারের পরিবেশ একটু অন্যরকম। কিন্তু অনেকে আছেন যারা সাধারণ সমর্থক। অথচ থিয়েটার ভালোবাসেন, বোঝেন মাওবাদী রাজনীতিও। তারা নানা ধরনের থিয়েটার অনুশীলন করেন। ওসমানিয়া ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নাট্যশৈলীকে দেখা যায়। প্রসেনিয়াম থিয়েটার কোনো পক্ষেরই খুব পছন্দের নয়। জঙ্গলে তো সেই পরিস্থিতিও নেই। শহরে মফস্বলে যে নাটকে ব্রেখটিয়ান ফর্মের প্রাধান্য, জঙ্গলে তাতে যুক্ত হয় কথাকলি, মোহিনীঅট্টাম, মহারাষ্ট্রের তামাশা, ছত্তিশগড়ি লোকশিল্প বাংলার আলকাপও। যা নিঃসন্দেহে এক অন্যধারা, নতুন সংযোজন গেরিলা থিয়েটারে।

শহর বা গ্রাম, জঙ্গল বা সমুদ্র সর্বত্রই কিন্তু মাওবাদী সংস্কৃতির অনুগামীরা সমাজের নিম্নবিত্তের জনগণ। ছোট কিষাণ, প্রান্তিকজন, মাঝিমাল্লা, অসংগঠিত শ্রমিক, খনিমজুর, রিক্সাওয়ালা, সব্জীবিক্রেতা—এরকম অজস্র গরীব গুর্বো মানুষজন। নাটকের বিষয়বস্তুতেও উঠে আসে তাদের জীবনযাত্রা। ব্যালেও কিন্তু মাওথিয়েটারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা। যা প্রাণ পেয়েছে অসম্ভব ভালো শারীরিক অভিনয়ের দৌলতে। কাহিনি নির্মাণেও নিম্নবর্গের প্রতিদিনের রোজনামচা। গদার একবার বলেছিলেন, 'আমরা যখন সমুদ্রের জেলেদের জীবন নিয়ে নাটক করি, লিখি তখন বেশ কিছুদিন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশি। প্রয়োজনে তাদের পরিবারে থাকি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি তাদের মাছ ধরার কৌশল, মাছ পেলে আনন্দ, না পেলে হতাশা, ঝড়-বৃষ্টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহাজনি শোষণ, সুখ-দুঃখ, প্রেম। পরে তা আরও রাজনৈতিক রং-এ মিলিয়ে পরিবেশিত হয় আমাদের থিয়েটারে, ব্যালেতে।

সাধারণত থিয়েটারে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় লোকশিল্পের সাবেক ঘরানায় যা থাকে। চিরুতলা (খঞ্জনি), কোলাটম (দুটি কাঠ একসঙ্গে বাজানো), ভগোতম, ডমরু, ঢোল ইত্যাদি। কখনো কখনো আধুনিক ম্যান্ডোলিনও থাকে। মাওবাদীদের খুব জনপ্রিয় ব্যালে 'রগল জেন্ডা'তে ম্যান্ডোলিন ব্যবহার করা হয়েছিল।

ছোট দুটি লাইন—'এ গাঁও হামারা, এ বস্তি হামারা'। সহজ এই দুটি বাক্য কিভাবে অসাধারণ এক পথনাটক হয়ে ওঠে অন্ধ্রে, সরকারের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছিল আজও তা প্রবীণদের মনে আছে। গদারের জনপ্রিয়তা তো অসাধারণ। ওঁকে বলা হয় ভারতের পিট সীগার। কিন্তু আমার তো মনে হয়েছে উনি দক্ষ অভিনেতাও। ওঁর অনুষ্ঠান যারা শুনেছেন, দেখেছেন তারাই এই মত মেনে নেবেন বিনা দ্বিধায়। পুরনো আই. পি. টি.-এর সোনার সময়ে গুরুদাস পাল, নিবারণ পণ্ডিত বা টগর অধিকারী ছিলেন জনপ্রিয়। তারা এক একটা অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার লোককে মুগ্ধ করে রাখতেন। যেমন মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, গম্ভীরার প্রবাদপ্রতিম মটরবাবু বা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাছে শুনতাম আলকাপের কিংবদন্তি ঝাকসু ওস্তাদের কথা—যারা এক এক রাতে সহজ ভঙ্গিতে নাটক করে মোহিত করতেন কয়েক হাজার গরীব জনগণকে। গদারও তেমনি এক একটা জায়গায় হাজির হলেই দূর দূর থেকে ছুটে আসেন হাজার

লাখ জনতা। খালি গায়ে আঁটো ধুতি পরে লাল পতাকা নিয়ে গদার শুরু করেন—শহীদ চারু মজুমদার কো লাল লাল লাল লাল সেলাম। তেলেঙ্গানার শহীদোঁ কো লাল লাল লাল সেলাম। শহীদ কিষাণজী কো রক্তে রাঙা লাল সেলাম। জনতা উদ্বেল হয়ে ওঠেন। হাততালি দেন। স্লোগান শুরু হয়—'এক হি রাস্তা, এক হি রাস্তা, নকশাল বাড়ি এক হি রাস্তা।' রাষ্ট্র ভয় পায়। গদারের নামে জারি হয় গ্রেপ্তারি পারোয়ানা। আত্মগোপন করেন ভিটঠল রাও গদার। নিষেধাজ্ঞা ওঠে জনতার চাপে। গদার বাইরে আসেন। শুরু হয় সেই গান, সেই অভিনেতা। রাষ্ট্র দারুণ ভয় পায়। গুলি চালানো হয় গদারকে খুন করার জন্য। প্রাণ কোনোরকমে বেঁচে যায়। ছ'টা গুলি। পাঁচটা অপারেশন করে বের হয়। একটা এখনও থেকে গেছে শরীরের মধ্যে।

তবু গদার গেয়ে চলেন। উদ্দীপ্ত করেন ছাত্র কৃষক শ্রমিক নিম্নবিওদের। তার গান, নাটক, অভিনয় ছড়িয়ে পড়ে বস্তার দন্ডকারণ্য, ওড়িশার ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খন্ড, মধ্যপ্রদেশ, কেরলের জঙ্গলে পাহাড়ে, সমুদ্রে, গাঁয়ে বন্দরে।

মাওবাদী নিষিদ্ধ সংস্কৃতি আর নিষিদ্ধ থাকে না। হয়ে পড়ে প্রকাশ্য এজেন্ডা। বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে যায় নাটক সংগীতের মধ্যে দিয়ে।

মাওবাদী রাজনীতি নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে। থাকবেও। কিন্তু বামপন্থী বা কৃষক রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা ইতিহাস মনে রাখবে। সংস্কৃতিতে তাদের নতুন সংযোজন, ভাষা, কাহিনি বিন্যাস ও সত্যিকারের পিপলস্ কালচারের উপস্থাপনা র‍্যাডিক্যাল প্যারাডাইসে চিরস্থায়ী হবে—এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নাটকের নির্দিষ্ট কাহিনি সাধারণত থাকে না বলেছি। কিন্তু কয়েক বছর আগে সাইকোস্টাইল একটি পত্রিকা বের হচ্ছে বস্তারের জঙ্গল থেকে—'ঝঙ্কার'। তাতে ছাপা হচ্ছে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও নাটকও। সেখানে লেখক হিসেবে যারা লিখছেন তারা অধিকাংশই গেরিলা সংগ্রামে এসে যোগ দিয়ে শিক্ষিত হয়েছেন অর্থাৎ লিখতে, পড়তে শিখেছেন। 'ঝঙ্কার'-এর একটি নাটক খুব সাফল্য পেয়েছে, তা একটি মেয়েকে নিয়ে লেখা। ওর নাম ব্যায়াক্কা। ও মহারাষ্ট্রের বালুরঘাটে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিল। দলে যখন ও যোগ দিয়েছিল তখন খুব ছোট। লিখতে পড়তে পারত না। কিন্তু পরে গেরিলা স্কোয়াডে থাকতে থাকতে বন্দুক চালানোর সঙ্গে লেখাপড়াও শিখল। শুধু শিখলই না। হয়ে উঠেছিল জনপ্রিয় কবি, গীতিকার ও নাটককার। ব্যায়াক্কার মতো অন্তত তিনশো শিল্পী, সাহিত্যিক, অভিনেতা নাটককার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে শহীদ হয়েছেন কিন্তু চলমান জনযুদ্ধের মতো সংস্কৃতিও বহমান—কার সাধ্য তাকে থামায়?